Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনির্মাণে ইসলাম

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ডাঃ ইসরাত জাহান সাথী

রোলঃ 228021548

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনির্মাণে ইসলাম

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ডাঃ ইসরাত জাহান সাথী

রোলঃ 228021548

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনির্মাণে ইসলাম " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ডাঃ ইসরাত জাহান সাথী, আইডিঃ 228021548 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: শারাফাত কারীম
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনির্মাণে ইসলাম " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: শারাফাত কারীম উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

ডাঃ ইসরাত জাহান সাথী

আইডিঃ 228021548

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

১. ভূমিকা ৫
২. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিঃ ৫
৩. সাম্প্রদায়িকতাঃ ৫
৪. ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতাঃ ৬
৫. সাম্প্রদায়িকতার কুফল : ৬
৬. সাম্প্রদায়িকতা বনাম একতাঃ ৭
৭. সাম্প্রদায়িকতা সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তাঃ ৭
৮. বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিঃ ৭
৯. বিশ্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিঃ... ৮
১০. হাদিসের আলোকে সাম্প্রদায়িকতা : ৮
১১. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে ইসলামী নীতিমালা ১০
১১.১ সর্বজনীন ইসলামী মূল্যবোধঃ ১০
১১.২ অভিন্ন উৎসমূল ও বিশ্ব পরিবারের চেতনা : ১১
১১.৩ সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের চেতনা...১২
১১.৪ মানবিক মর্যাদার সর্বজনীনতাঃ ১৩
১১.৫ মানব জীবনের সর্বজনীন নিরাপত্তা..১৩
১১.৬ ন্যায় বিচার ও আইনে দৃষ্টিতে সমতা ১৪
১১.৭ পারস্পরিক ধর্মবিশ্বাসকে অসম্মান না করা ১৫
১১.৮ সকল সম্প্রদায়ের কাছেই আল্লাহর বাণী ১৬
১১.৯ সহাবস্থান ও সদাচরণ ১৭
১১.১০ উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও ক্ষমার নীতি অবলম্বন...১৯
১১.১১ উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনা নিষিদ্ধঃ ২১
১১.১২ বৈষম্যহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সামাজিক নিরাপত্তাঃ ২২
১১.১৩ বিদায় হজ্জের ভাষণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহাসিক ঘোষণাঃ ২৩
১১.১৪ ইসলামী আইনে জোর জবরদস্তি নিষিদ্ধ...২৪
১১.১৫ বিতর্ক করো উত্তম পন্থায়...২৫

১১.১৬ উস্কানিমূলক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ ২৬
সংকীর্নতা পরিহার করে মুসলিমদের ইসলামের উদারতার ইতিহাস জানা প্রয়োজন: ২৮
সত্যিকারের মুসলিম ব্যক্তি কখনো সাম্প্রদায়িক হতে পারেন না: ২৯
উপসংহার ২৯

ভূমিকা

ইসলাম এক শাশ্বত জীবনব্যবস্থা। এ জীবনব্যবস্থা অশান্ত, বিশৃঙ্খল ও শতধা-বিভক্ত সমাজে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ ও স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করতে নির্দেশনা প্রদান করে। ইসলাম ঐশী নির্দেশনায় বিশ্বমানবতাকে এমন এক সভ্যতা উপহার দেয়, যা মানুষকে মানবতা, পরমত সহিষ্ণুতা এবং ঔদার্যের দৃষ্টিকোণ থেকে উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করতে শেখায়। ফলে ঐশ্বরিক জ্ঞানে আলোকিত হয় সমাজ; তিরোহিত হয় নিষ্ঠুরতা, বর্বরতা ও ধর্মীয় কলহ

বিবাদ। ইসলামের নিরন্তর প্রয়াসে মানুষ সম্প্রদায়গত ভিন্নতা ও ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ফলে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে ইসলাম নির্যাতিত, নিষ্পেষিত ও উপেক্ষিত গণমানুষের দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বিশ্ব পরিমণ্ডলে সব ধর্মের মানুষের মাঝে স্থাপন করে এক অপূর্ব মেলবন্ধন। মুসলিম অধ্যুষিত জনপদে সংখ্যালঘু অমুসলিমদের মাঝে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলাম প্রদর্শিত মূলনীতি

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিঃ

সম্প্রদায় বলতে এমন একটি জনগোষ্ঠীকে বোঝায়, যারা নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট এলাকায় ভাষা, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, প্রথা, রীতি-নীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি অনুসরণের মাধ্যমে বসবাস করে এবং অন্য সম্প্রদায় থেকে নিজেদেরকে পৃথক ও স্বতন্ত্র মনে করে। এ গবেষণায় সম্প্রদায় শব্দ দ্বারা ধর্মীয় সম্প্রদায়কে বুঝানো হয়েছে। যেমন হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ইত্যাদি সম্প্রদায়। একটি সম্প্রদায়ের মৌলিক নীতিমালা সে সম্প্রদায়ের সকল সদস্যকে পারস্পরিক মেলবন্ধনে আবদ্ধ করে। একইভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একটি রাষ্ট্রের কাঠামোতে আবদ্ধ রাখে। হিংসা-বিদ্বেষ, সংঘাত

সহিংসতার পরিবর্তে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ পারস্পরিক ভালোবাসা, সাম্য ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সামাজিক পরিবেশে বসবাস করে। একটি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তির ফলে সমাজ কিংবা রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো প্রকার বৈষম্যের শিকার না হয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ সামগ্রিক পরিবেশকে বুঝানো হয়।

সাম্প্রদায়িকতাঃ

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বিপরীত হলো সাম্প্রদায়িকতা। যা মূলত এমন মনোভাব, যা সমাজব্যবস্থার মত বৃহৎ পরিসরকে বাদ দিয়ে সমাজের ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনকে বুঝিয়ে থাকে। একজন ব্যক্তির মনোভাবকে তখনই সাম্প্রদায়িক আখ্যা দেয়া হয়, যখন সে এক বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ভুক্তির ভিত্তিতে অন্য কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধাচরণ ও ক্ষতিসাধন করতে প্রস্তুত থাকে (Umar ১৯৯৫, ১১)।

একইভাবে বলা যায় "যে ব্যক্তি অন্য সম্প্রদায়ের মানুষদের সহ্য করতে পারেন না; বরং বিদ্বেষমূলক ভাব পোষণ করেন এবং ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের উদার দৃষ্টিতে দেখার পরিবর্তে ঘৃণা করেন তিনি সাম্প্রদায়িক (Abdul Latif ২০১৮, ২৯)।"

সাম্প্রদায়িকতা হলো সম্প্রদায়ভিত্তিক জাত্যভিমান। যখন একটি সম্প্রদায় নিজেকে অন্যসব সম্প্রদায় কিংবা কোনো একটি বিশেষ সম্প্রদায় থেকে উৎকৃষ্ট মনে করে, নিজেদের সবকিছুকে ভালো মনে করে, অন্য সম্প্রদায়কে নিকৃষ্ট কিংবা ছোট মনে করে তখন সেই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে জন্ম নেয় সাম্প্রদায়িকতা। সাম্প্রদায়িকতা হলো এমন একটি বোধ যা মানুষকে নিজেদের সাম্প্রদায়কে শ্রেষ্ঠ ভাবতে শেখায় এবং সেই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য অন্য সাম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ সৃষ্টি করে। এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়ের ক্ষতি করার জন্য, তাদেরকে দমিয়ে রাখার জন্য, ধ্বংস করার জন্য মেতে ওঠে বর্বরতায়।

ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতাঃ

ধর্মের ভিত্তিতেই মানুষের পৃথক পৃথক সম্প্রদায় সবচেয়ে বেশি গড়ে ওঠে। যেমন কেউ মুসলিম সম্প্রদায়ের আবার কেউ হিন্দু, বৌদ্ধ কিংবা খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ। আবার একটি ধর্মের ভেতরেও আছে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের মানুষ। যেমন মুলমানদের ক্ষেত্রে কেউ সুন্নি কেউবা শিয়া। খ্রিস্টানদের মধ্যে কেউ ক্যাথলিক আবার কেউ প্রোটেস্ট্যান্ট। হিন্দুদের মধ্যে কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ ক্ষত্রিয় আবার কেউবা শুদ্র। যদিও ধর্ম সম্প্রদায় সৃষ্টি করে, তাই বলে ধর্ম কখনো কাউকে সাম্প্রদায়িক হতে বলে না। তাছাড়া ধর্ম কখনো সাম্প্রদায়িকতাকে সমর্থনও দেয় না। কারণ সকল ধর্মই মানুষকে শান্তি ও সম্প্রীতির পথ দেখায়।

সাম্প্রদায়িকতার কুফল :

সাম্প্রদায়িকতা মানুষকে এতই অন্ধ করে দেয়, বিচার বুদ্ধিহীন করে দেয় যে সুদীর্ঘকাল ধরে তিল তিল করে গড়ে তোলা লোকালয়কে মুহূর্তের মধ্যে বিরাণ ভূমি বানিয়ে ফেলতে মানুষ দ্বিধাবোধ করে না। সাম্প্রদায়িকতা কখনো কারো কোনো মঙ্গল করতে পারে না। সাম্প্রদায়িকতা কেবল মাত্র মানুষে মানুষে হিংসা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, ক্রোধ, মারামারি, কাটাকাটি, হানাহানি সৃষ্টি করতে পারে। এটা মানুষকে সংঘাত ও সংঘর্ষে উৎসাহী করে তোলে। মানুষকে করে সহিংসতাপ্রেমী ও যুদ্ধবাজ। সাম্প্রদায়িকতা মানুষকে বর্বর ও পাশবিক করে তোলে। মানুষের ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতিকে বিনষ্ট করে এই সাম্প্রদায়িকতা। ফলে জাতীয় জীবন স্থবির হয়ে পড়ে। মানুষের সম্পদ ও প্রাণহানী ঘটে। সমাজে অরাজকতা ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়। জাতীয় অগ্রগতি থমকে যায়।

সাম্প্রদায়িকতা বনাম একতাঃ

সাম্প্রদায়িকতা একটি সম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। কারণ সাম্প্রদায়িক চেতনা মানুষকে ভাবতে শেখায় যে সে অন্যদের থেকে আলাদা। ফলে সম্পূর্ণ একা একটি সম্প্রদায় জোর গলায় কিছু বলতে পারে না। কারো বিরুদ্ধে গিয়ে কিছু বলতেও পারে না। একটি দেশ ও দেশের ভবিষ্যৎ নির্মাণের জন্য একতা ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি খুবই ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। কৃষক, শ্রমিক, কামার, কুমার, তাঁতি, ছুতার, মুচি সবাই যখন এক হয়ে এক পতাকার নিচে এসে আপামর জনসাধারণ হিসেবে কাজ করে তখন ব্যক্তির, সমাজের, দেশের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হয়। মানুষ যখন সাম্প্রদায়িকতাকে ভুলে একতাকে অবলম্বন করে বেঁচে থাকে তখন জীবন গতিময় হয়ে ওঠে। ঐক্য বা একতা সবসময়ই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধাচরণ করে। যে দেশের মানুষ সাম্প্রদায়িকতাকে বিশ্বাস না করে ঐক্যে বিশ্বাস করে তারাই উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারায় সামিল হয়ে এগিয়ে যায়। ঐক্যের শক্তি দিয়ে তারাই সাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিরোধ করে।

সাম্প্রদায়িকতা সম্প্রীতির প্রয়োজনীয়তাঃ

দেশ ও জাতি গঠনে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অপরিহার্য একটি বিষয়। একটি দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করতে পারে। কিন্তু তাদের মধ্যে যদি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি না থাকে তাহলে তারা কখনোই একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত হতে পারে না। সাম্প্রদায়িক সম্প্রতির অভাবে সেই জাতির ভেতরে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এতে করে সমাজ ও দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হলে সমাজ ব্যবস্থা অস্থিতিশীল হয়ে পড়ে। চারিদিকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। ফলে অনিবার্যভাবেই যুদ্ধ ও সংঘাত দেখা দেয়। মানুষে মানুষে আস্থার অভাব দেখা দেয়, অবিশ্বাসের সৃষ্টি হয়, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার পথ বন্ধ হয়ে যায়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি না থাকলে দেশে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। ফলে ব্যাপক প্রাণহানী ঘটে, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংস হয়। দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়। এমন কি কখনো কখনো দেশের সার্বভৌমত্বও হুমকির মুখে পড়ে। শুধুমাত্র একটি দেশের ভেতরেই নয় আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি খুবই জরুরি। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি না থাকলে গোটা বিশ্বই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিঃ

বাংলাদেশ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দেশ। এদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এক সাথে বাস করে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিস্টান। এটি আমাদের গৌরব যে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ এক জাতি। আমরা বাঙালি জাতি, বাংলাদেশিরা খুব সচেতন ভাবেই বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হই। সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতা আমাদের আদর্শ। পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা আমাদের ধর্ম। ৫২, ৬৯, ৭০, ৭১-এ বাঙালি জাতি তাদের অসম্প্রদায়িক চেতনার স্বাক্ষর রেখেছে। তাদের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আর একতাকে চিরভাস্বর করেছে। মুক্তিযুদ্ধে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, খাসিয়া, সাঁওতাল নির্বিশেষে সকলে এক হয়ে যুদ্ধ করেছে। আমাদের প্রত্যেকটি উৎসবে বাঙালি জাতি এক হয়ে যায়। পহেলা বৈশাখ, ঈদ, পূজা, বড়দিন, বৌদ্ধপূর্ণিমা, বৈসাবি আর জাতীয় দিবসগুলোতে সাম্প্রদায়িক পরিচয় ভুলে এক জাতি হিসেবে সকলে সমান অংশগ্রহণ করে। কিন্তু এই সম্প্রীতির মধ্যেও কিছু কিছু ধর্মান্ধ মানুষের কারণে এই দেশেও কখনো কখনো আঘাত হেনেছে সাম্প্রদায়িকতা। '৯০-র দশকে ভারতের

অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ফলে এদেশেও দাঙ্গা সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন জাতীয় নির্বাচন পরবর্তী সময়েও ঘটেছে কিছু অনাকাঙ্খিত ঘটনা। কিন্তু তার পরেও সবকিছু ছাপিয়ে বিশ্বে আমরা অসম্প্রদায়িক জাতি হিসেবে পরিচিত।

বিশ্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিঃ

এক দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা কিংবা যুদ্ধ অন্য দেশকেও প্রভাবিত করে। ফলে বিশ্বের শান্তি রক্ষায় ও প্রয়োজন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। কিন্তু বর্তমানে বিশ্ব পরিস্থিতি খুবই নাজুক। সবখানেই চলছে হানা-হানি, মারামারি। ভারতের মতো বৃহৎ গণতান্ত্রিক একটি দেশেও সংখ্যালঘুরা ভুগছে নিরাপত্তাহীনতায়। মুজাফফরনগর দাঙ্গাই তার প্রমাণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলার যে ইহুদি নিধনে নেমেছিল আজ তারাই ফিলিস্তিনি মুসলমানদেরকে ধ্বংস করতে যুদ্ধে নেমেছে। মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার অনেক দেশে চলছে সাম্প্রদায়িকতার নামে বর্বরতা। ইরাক, ইরানে শিয়া-সুন্নির সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ রূপ নিয়েছিল যুদ্ধে। চীনে মুসলিম অধ্যুষিত প্রদেশের মুসলমানরা সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশে এখনো ঘোচেনি সাদা-কালোর ব্যবধান। আফ্রিকার বর্ণবাদ তো সকলেরই জানা। ফলে বিশ্বে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি এখন খুবই কোনঠাসা অবস্থায় রয়েছে।

হাদিসের আলোকে সাম্প্রদায়িকতা :

সাম্প্রদায়িকতা বিষয়ে ইসলামের শিক্ষাগুলোর দিকে নজর দিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রথমেই দেখা যাক ইসলাম সাম্প্রদায়িকতাকে কীভাবে চিহ্নিত করেছে। একজন সাহাবি রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলেন 'আসাবিয়্যাত' (সাম্প্রদায়িকতা) কী? জবাবে তিনি ইরশাদ করলেন, অন্যায় কাজে স্বগোত্র-স্বজাতির পক্ষে দাঁড়ানো। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস ৫০৭৮)

অর্থাৎ অন্যায় ও জুলুমের কাজে কাউকে শুধু এ জন্য সমর্থন করা যে, সে তার নিজ দল, গোত্র, জাতি ও ধর্মের লোক- এটিই সাম্প্রদায়িকতা। আপনি কোরআনুল কারিমের সুরা নিসার শুরুথেকে পড়ুন, দেখবেন ইসলাম মানবতার বন্ধনকে কীভাবে দৃঢ় করেছে। আল্লাহতায়ালা কীভাবে সব মানুষকে একই বাবা-মার সন্তান ঘোষণা দিয়ে তাদের পরস্পরের আপন বানিয়েছেন।

হজরত হুজাইফা (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসুলে কারিম (সা.) করেছেন, সব জাতি যেন তাদের বাপ-দাদা তথা বংশ নিয়ে গর্ববোধ থেকে ফিরে আসে অন্যথায় তারা আল্লাহর কাছে নাপাকির পোকামাকড় থেকেও নিকৃষ্ট গণ্য হবে। (মুসনাদে বাজজার, হাদিস ২৯৩৮)

সুনানে আবু দাউদের অন্য বর্ণনায় আল্লাহর রাসুল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষকে আসাবিয়্যাতের (সাম্প্রদায়িকতা) দিকে আহ্বান করবে (অর্থাৎ অন্যায় কাজে নিজ দল, গোত্র, জাতিকে সাহায্য করতে বলবে) সে আমাদের (মুসলমানদের) দলভুক্ত নয়। যে এমন সাম্প্রদায়িকতার কারণে মৃত্যুবরণ করবে সেও আমাদের দলভুক্ত নয়। (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস ৫০৮০)

এ হাদিস এবং এ বিষয়ে আরো একাধিক সহিহ হাদিসের মর্ম এই যে, যে ব্যক্তি জাতীয়তা বা ভাষার ভিত্তিতে অন্যায় হওয়া সত্ত্বেও পরস্পর সহযোগিতা করে এবং দল, গোত্র, বংশের ভিত্তিতে অন্যকে সাহায্য করতে গিয়ে মারা যায় সে জাহেলিয়াতের মৃত্যুবরণ করল। যে উম্মতের বিরুদ্ধে অস্ত্র উঠিয়ে ভালোমন্দ সবাইকে হত্যা করতে থাকে সে মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত নয়।

আর বিদায় হজের বিখ্যাত ভাষণের কথা তো সবারই জানা। যেখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন, ভাষা, বর্ণ ও গোত্রের ভিত্তিতে কারো ওপর কারো প্রাধান্য নেই। তিনি বলেছেন, কোনো আরব অনারবের ওপর (শুধু ভাষার কারণে) প্রাধান্য পাবে না। কোনো সাদা (তার বর্ণের কারণে) কালোর ওপর প্রাধান্য দাবি করতে পারবে না। প্রাধান্যের একমাত্র ভিত্তি হবে তাকওয়া (মুসনাদে আহমদ, হাদিনস ২৩৪৮৭)।

উপরোক্ত হাদিসগুলো এবং কোরআন-সুন্নাহর সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আয়াত ও হাদিস-আসারগুলো অধ্যয়ন করলে যেকোনো বিবেকবান মানুষ সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবে ইসলামের ব্যাখ্যায় সাম্প্রদায়িকতার আওতা কত বিস্তৃত এবং কত কঠোরভাবে ইসলাম এর নিন্দা ও বিরোধিতা করে। ইসলামপূর্ব জাহিলিয়াত যুগে মানুষ বিভিন্ন গোত্রে তাদের জাতীয়তাকে বিভক্ত করে ফেলেছিল। শুধু জাত-গোষ্ঠীর নামে কথায় কথায় যুদ্ধ হতো। হত্যা-লুণ্ঠন হতো। ধনাঢ্য লোকজন, নেতা-সর্দাররা থাকত সব বিচারের উর্ধ্বে। বিচারের সম্মুখীন হতো কেবল সাধারণ অসহায় মানুষ। রাসুলে কারিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুরুথেকেই এসবের মূলে আঘাত করেছেন।

কিন্তু আধুনিক ইউরোপ মানুষকে দেশ, বর্ণ, দল ও ভাষার ভিত্তিতে বিভক্ত করে প্রকারান্তরে পুনরায় জাহিলিয়াত যুগেই নিয়ে গেছে। এখন দলের লোক, গোত্রের লোক, সম্প্রদায়ের লোক, নিজ পেশার বা গ্রুপের লোক কিংবা দেশের লোক যত অন্যায়ই করুক তার সম্প্রদায়ের লোকেরা তার পক্ষই অবলম্বন করবে। অন্য পক্ষ যতই মজলুম, অসহায়, নির্যাতিত হোক তার প্রতি সদয় হবে না তারা। আমাদের দেশের রাজনৈতিক দলগুলো, ছাত্রসংগঠনগুলো, বিভিন্ন পেশাজীবী সম্প্রদায় এবং তাদের কর্মকান্ড দেখলেই আপনার কাছে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাদের দলের সর্বোচ্চ ব্যক্তি যত বড় মিথ্যা বক্তব্যই দিক তারা সেটা প্রচার করতে থাকবে। তাদের দলের পরিচয়ে কোনো নেতাকর্মী যত অপকর্মই করুক তারা সেটিকে কোনো দোষই মনে করবে না এবং বেশি চাপে পড়ে গেলে তা অস্বীকার করে দিবে। এমনিভাবে তাদের কোনো লোক কোনো সংখ্যালঘুর ওপর আক্রমণ করলে বা তার জানমালের ক্ষতি করলেও তারা আক্রমণকারীর পক্ষেই যাবে এবং তাকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে যদিও তারা ধর্মনিরপেক্ষতার অন্যতম প্রবক্তা। ওপরের যে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো তার সবই ইসলামের দৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িকতা এবং কঠোর নিন্দনীয় এবং ইহ ও পরকালীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অথচ বর্তমান সময়ের প্রচারমাধ্যমগুলো এখন এগুলোকে সাম্প্রদায়িকতা হিসেবে দেখতেই চায় না। আর ইসলামি রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিম সংখ্যালঘুদের জানমাল তো মুসলমানদের মতোই। কোনো মুসলমানের জন্য যেমন তার দেশের আইন মেনে বসবাসকারী অমুসলিমের ওপর কোনো ধরনের নির্যাতনের সুযোগ নেই তেমনি অন্য কোনো মুসলিমকে এমনটি করতে দেখলে সাধ্য অনুযায়ী এ অন্যায় কাজ থেকে তাকে নিবৃত্ত রাখার চেষ্টা করাও তার দায়িত্ব। তা না করে উল্টো জালেমকে সমর্থন করলে সেটি হবে চরম সাম্প্রদায়িকতা।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে সাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবাদ নিয়ে বলার মতো অনেক কথাই আছে। আজ আমি শুধু এ কথা বলতে চাই এবং চ্যালেঞ্জ দিয়ে নিবেদন করতে চাই যে, কোনো দেশে ইসলামি বিধিবিধান চালু থাকলে সেখানে সব সাম্প্রদায়িকতা শুধু নিষিদ্ধই থাকবে না; বরং কেউ এমন অপকর্মে লিপ্ত হলে সে শুধু আখিরাতেই পাকড়াও হবে না; বরং ইসলামি আইন দুনিয়াতেই তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করবে। অর্থাৎ সাম্প্রদায়িকতা দমনের একমাত্র হাতিয়ার হচ্ছে ইসলামি আদর্শে জাতিকে গড়ে তোলা, কোরআন-সুন্নাহ

তথা শরিয়াহ অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করা। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা, সেক্যুলার রাষ্ট্রযন্ত্র কখনো সাম্প্রদায়িকতামুক্ত মানবজাতি উপহার দিতে পারে না। বর্তমান ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের সময়ে সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ (আক্রান্তদের অনেকেই বলেছে সরকারদলীয় লোকেরাই এতে জড়িত ছিল) তারই প্রমাণ বহন করে।

এমনিভাবে রাজনৈতিক-অরাজনৈতিক সংগঠনগুলোর সহিংস কর্মকান্ড এবং তাদের দল ও মুরব্বিরা অন্যায়কারী জালিমদের সহযোগিতা ও সমর্থন এই ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের সময়ে হতে পারার মানেই হলো এ ধর্মহীন তথাকথিত নীতি সাম্প্রদায়িকতা দমনের জন্য যথেষ্ট নয়। শুধু আমাদের দেশেই নয় প্রতিবেশী দুটি দেশের রাজনৈতিক-সাম্প্রদায়িক ঘটনা এবং পশ্চিমের দেশগুলোর স্কুল ও বিভিন্ন জনসমাগমস্থলে অস্ত্রধারীদের গুলির ঘটনা ও আক্রমণকারীর বক্তব্যই আপনাকে জানান দেবে রাষ্ট্র সেক্যুলার নামধারী হলেও জাতি সাম্প্রদায়িকতামুক্ত হয় না। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্তির জন্য চাই ইসলামি আদর্শ ও শিক্ষা, ধর্মনিরপেক্ষতা নয়।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে ইসলামী নীতিমালা

সর্বজনীন ইসলামী মূল্যবোধঃ

ইসলামের বিধান সর্ব যুগের ও সকল মানুষের কল্যাণের পথ দেখায়। এ ধর্ম কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নামের সাথে সম্পৃক্ত ধর্ম নয় যেমনটি হয়েছে ইহুদার নামে ইহুদি ধর্ম, গৌতম বুদ্ধের নামে বৌদ্ধ ধর্ম, যীশু খ্রিস্টের নামে খ্রিস্ট ধর্ম ইত্যাদি। বরং এটি একটি সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা হিসাবে আল্লাহ তা'আলাই এর নামকরণ করেছেন ইসলাম। এটি রিসালাতের সর্বশেষ সীল মোহর; যা মূলত সকল মানুষকে শান্তি ও কল্যাণের দিকে আহ্বান করে। আল্লাহ প্রদত্ত এ বিধান যে সমাজে থাকবে সেখানকার সকল সম্প্রদায়ের মানুষ নিরাপদ ও শান্তিতে থাকবে। কেননা, ইসলামী জীবনব্যবস্থায় সকল মানুষের নিরাপত্তা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত। যারা ইসলামের ব্যবস্থাকে মেনে নিয়ে মুসলিমদের দলভুক্ত হবে তারা যেমন শান্তি ও নিরাপদে থাকবে, একইভাবে যারা অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসী সম্প্রদায় থাকবে তাদের স্ব-স্ব ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও কর্মকাণ্ড স্বাধীন ও সাবলীলভাবে সম্পাদন করতে পারবে। এখানে কেউ তাদের বাধা দিতে পারবে না। যার ফলে সমাজের সকল মানুষের মাঝে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি গড়ে ওঠবে।

ইসলামের নৈতিক শিক্ষা দ্বারা একজন মুসলিমের জীবন পরিচালিত হয়। যা একজন মানুষকে সত্য ও ন্যায়ের পথে পরিচালিত করে। মানুষের মাঝে ন্যায়-অন্যায়বোধ জন্ম দেয়। মানুষকে সত্যাশ্রয়ী ও বিবেকবান হিসাবে গড়ে তোলে। এ সকল নৈতিক শিক্ষা যেমন ন্যায়বিচার (আদল), দয়া (রাহমাহ), ভালো কাজ করা (ইহসান), উদারতা, ভালোবাসা, বিনয়, সাহসিকতা, বদান্যতা, মহানুভবতা, পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি অন্যান্য ধর্মের শিক্ষাতেও বিদ্যমান। আবার কিছু কাজ যেগুলো ইসলামসহ অনেক ধর্মই নিষিদ্ধ করেছে। যেমন চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, সন্ত্রাস, রাহাজানি, অত্যাচার, ব্যভিচার, প্রতারণা, ইয়াতিমের সম্পদ গ্রাস করা, অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা ইত্যাদি (Fadzil ২০১১, ৩৫৫)।" আল-কুরআন রিসালাতের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত ব্যবস্থা, যার সকল বিধিবিধান সর্বজনীন, সময়োপযোগী ও পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের সত্যায়নকারী।

অভিন্ন উৎসমূল ও বিশ্ব পরিবারের চেতনা :

ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষের আদি উৎস অভিন্ন। সকল মানুষই এ বিশ্ব পরিবারের সদস্য। এ পরিবারে শান্তি ও সৌহার্দ্য বজায় রাখার জন্য প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা ইসলামে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাগ্রন্থ

তোমাদের এ উম্মত আসলে একই উম্মত। আর আমিই তোমাদের প্রতিপালক। অতএব, আমারই ইবাদত কর। কিন্তু মানুষ নিজেদের কার্যকলাপে পরস্পরের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছে, প্রত্যেকেই আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে (Al-Quran, ২১:৯২-৯৩)। আল- কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে:

এ আয়াতে 'তোমরা' বলে সমগ্র মানবজাতিকে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ হে মানবজাতি, তোমরা আসলে একই দল ও একই মিল্লাতের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَآيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَ بَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيْرًا وَّ نِسَآءً

হে মানব জাতি! তোমাদের প্রভুকে ভয় করো। যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে। আর সেই প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া এবং তাদের দুজন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নর এবং নারী (Al Quran, ০৪:০১)।

এ আয়াতের মর্মার্থ হলো- মানব জাতি একে অন্যের অতি আপনজন। কারণ, এক মানুষ থেকেই পৃথিবীর সকল মানুষের সৃষ্টি এবং রক্ত-মাংস ও শারীরিক উপাদানের দিক দিয়ে তারা প্রত্যেকে প্রত্যেকের অংশ। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফিজ ইবনে কাছীর রহ. বলেছেন,

من آدم وحواء رجالا كثيرا ونساء، ونشرهم فى أقطار العالم على اختلاف أصنافهم وصفاتهم وألوانهم ولغاتهم، ثم إليه بعد ذالك المعاد والمحشر

অর্থাৎ আদম ও হাওয়া (আ.) থেকে পৃথিবীর সকল মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। তারপর তিনি তাদেরকে গোত্র, বৈশিষ্ট্য, বর্ণ ও ভাষার বৈচিত্র্য সহকারে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দিয়েছেন অতঃপর তাঁর দিকেই সকলের প্রত্যাবর্তন ও সম্মিলন (Ibn Kathir ১৯৯৯, ১/৩৫৪)।

মানবজাতি উৎপত্তির শুরু থেকেই সকলে পরস্পরের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ। কারণ মূল থেকেই তাদের বংশ পরিচয় এক এবং অভিন্ন। এ মৌলিক সত্যটি পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন এজন্য যে, মানুষ যেন ধর্ম, বর্ণ, গোত্র কিংবা বংশ পরিচয়ের কারণে তার আসল পরিচয় ভুলে না যায়। আদি উৎসমূল একই হওয়ার কারণে নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক অনুভব করে শান্তিতে বসবাস করে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় 'তাফসীর ফি যিলালিল কুর'আন' এ উল্লেখ করা হয়েছে যে,

اِنَّ هٰذِهٖۤ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً ۖ وَّ اَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْنِ ﴿۹۲﴾ وَ تَقَطَّعُوْۤا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ؕ كُلٌّ اِلَيْنَا رٰجِعُوْنَ ﴿۹۳﴾

"সকল নবীর উম্মতরা আসলে তোমাদেরই উম্মত। সকলের একই ধর্ম, একই আকীদা-বিশ্বাস, একই জীবনব্যবস্থা এবং তা হচ্ছে একমাত্র আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করা; অন্য কারো নয় (Qutub ১৪১২ঐ, ৪/২৩৯৫)"।

হাফিয ইব্‌ন কাছীর এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স.) বলেছেন:

والأنبياء أخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد

মা ভিন্ন হলেও নবীগণ পরস্পর বৈমাত্রেয় ভাই, তাদের সবারই একই দীন (Al-Bukhari ২০০২, ৮৫৪/৩৪৪৩)।

ইসলামের এ সকল বক্তব্যের মাধ্যমে এ কথাই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, মুসলিম-অমুসলিম সকলকে নিয়েই আল্লাহ তা'আলার এ বিশ্বপরিবার। সৃষ্টিগতভাবেই মানুষের মধ্যে রয়েছে সুশৃঙ্খল বন্ধন, যা কোনোভাবেই ছিন্ন করে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করা উচিত নয়।

সর্বজনীন ভ্রাতৃত্বের চেতনা

সকল সম্প্রদায়ের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সমমর্যাদার ভিত্তিতে সমাজে বসবাস করা প্রতিটি মুসলিমের কর্তব্য। কেননা, ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্বের সকল মানুষ আশরাফুল মাখলুকাতের অন্তর্ভুক্ত। একই আদমের সন্তান, একই পরিবারের সদস্য এবং একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। মানবসমাজে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অত্যন্ত দৃঢ় ও মজবুত ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান। যার কারণে আল্লাহ তা'আলা মানুষদের এ বন্ধনে আবদ্ধ করে নিজের পরিবারের সদস্যদের প্রতি যেমন সদয় ও সহানুভূতিশীল, তেমনি বিশ্বপরিবারের সকল সদস্যের প্রতিও একইভাবে সহানুভূতিশীল ও সদয় হওয়ার নির্দেশনা দিয়েছেন। মহানবী (সাঃ) ঘোষণা করেছেন:

الخلق كلهم عيال الله فأحب الخلق إلى لله أنفعهم لعياله

সকল সৃষ্টিই আল্লাহ তা'আলার পরিবারভুক্ত। আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক প্রিয় সেই ব্যক্তি, যে তাঁর পরিবারভুক্তদের সর্বাধিক কল্যাণ সাধন করে। (Al-Tabarani ND, ১০/১০৫, ১০০৩৩)।

কিন্তু মানুষ বিশ্ব মানবতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের চেতনা উপেক্ষা করে নিজেদেরকে বংশ, গোত্র, গোষ্ঠী, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ইত্যাদি নানা বৃত্তে আবদ্ধ করেছে। নিজ বৃত্তের ভিতরের লোকজনকে আপন এবং বৃত্তের বাইরের লোকজনকে দূরের লোক বলে গণ্য করে। যার ফলে মানুষের মাঝে বিভেদ ও দূরত্ব সৃষ্টি হয়। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মানুষদের মাঝে যে পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন তা তাদের মর্যাদার জন্য নয়, বরং পারস্পরিক পরিচিতির জন্য। এ বিষয়ে আল্লাহ বলেন, এ প্রসঙ্গে ড. জামাল বাদাওয়ী বলেন, মুসলিম কিংবা অমুসলিম যে কাউকে ভীতি প্রদর্শন বা অপদস্ত করা কিংবা কোনো ধরনের অমানবিক আচরণ করা নীতিগতভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। কেননা, এধরনের আচরণ মানবিক মর্যাদার পরিপন্থী, যা কোনোভাবেই একজন ঈমানদার ব্যক্তির জন্য শোভনীয় নয়। যারা এসব কাজ করে তারা আল্লাহর কাছ থেকে দূরে সরে যায়। কারণ, যে ব্যক্তি এখন আল্লাহকে অস্বীকার করছে সে যেকোনো সময় ঈমান গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া কোনো ব্যক্তি যদি অপরাধ করে সেজন্য তাকে প্রচলিত আইন অনুযায়ী শাস্তি দেয়া হবে; কিন্তু তার মানবিক মর্যাদার অবনমন করা যাবে না। তাই ধর্ম, তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন, বর্ণ, গোত্র কিংবা ভাষা কোনো পরিচয়ই ইসলামের বিধান মতে মুখ্য নয়। তার আসল পরিচয় হলো মানুষ। মানুষ হিসাবে অভিন্ন মর্যাদার স্থান। প্রত্যেকের রয়েছে (Al-Badawi ২০১৬)। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ؕ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿١٣﴾

হে মানবজাতি! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের মাঝে বানিয়েছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্র, যেন তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদা সম্পন্ন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে অধিক ভয় করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছু জানেন এবং সব কিছুর খবর রাখেন (Al-Quran, ৪৯:১৩)।

এখানে আরবী ‘তা‘আরাফু’ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যার অর্থ পরস্পরকে জানা, চেনা ও বোঝা। অর্থাৎ পৃথিবীর সকল মানুষ অভিন্ন ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ। তারা একে অপরকে জানবে ও বুঝবে এবং সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মিলেমিশে বসবাস করবে।

মানবিক মর্যাদার সর্বজনীনতা:

এ পৃথিবীর সকল মানুষ আদমের সন্তান- এ কথাগুলো কেউই অস্বীকার কোনো মানুষই আল্লাহ তা‘আলার দয়া ও রহমত থেকে মাহরুম নয়। যেমন চন্দ্র, সূর্য, বায়ুমণ্ডল কিংবা বারিমণ্ডল থেকে মুসলিমদের জন্য বেশি আর অমুসলিমদের জন্য কম সুবিধার ব্যবস্থা করা হয়নি। পার্থিব জীবনে মুসলিম অমুসলিমের মধ্যে মর্যাদাগত যদি কোনো পার্থাক্য থাকত, তাহলে আল্লাহ তা‘আলাই তার প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা আলাদা করে দিতেন। আল্লাহ তা‘আলা সেটা না করে সকলের কাছে স্পষ্ট এ বার্তাই দিয়েছেন যে, তোমরা সকলেই সমান। সুতরাং সকলেরই উচিত, শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রেখে সমাজে বসবাস করা।

মানব জীবনের সর্বজনীন নিরাপত্তা

মানব জীবনের গুরুত্ব নিয়ে কুরআনে একাধিক আয়াত নাযিল হয়েছে। এ আয়াতগুলো শুধু মুসলিম নয় বরং সামগ্রিকভাবে মানুষের জীবনকে বুঝানো হয়েছে। প্রত্যেক মানুষের জীবন মূল্যবান ও পবিত্র। একে সম্মান করা প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, করতে পারে না। সে আল্লাহর প্রতি অনুগত হোক কিংবা আল্লাহর অবাধ্য হোক। এ মূল্যবোধ থেকে মানুষের মাঝে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির চেতনা জাগ্রত হয়। সকল মানুষের মর্যাদার সর্বজনীনতার ঘোষণা আল্লাহ তা‘আলা কুরআনে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন,

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِی الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَ مَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَاۤ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا ؕ وَ لَقَدْ جَآءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنٰتِ ۫ ثُمَّ اِنَّ كَثِيْرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ فِی الْاَرْضِ لَمُسْرِفُوْنَ ﴿٣٢﴾

যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করে এবং যে ব্যক্তি কারও জীবন রক্ষা করে সে যেন সমগ্র মানবজাতির জীবন রক্ষা করল। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ

নিশ্চয়ই আমি আদম সন্তানকে মর্যাদা দান করেছি (Al-Quran, ১৭:৭০)।

তাদের কাছে আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলি নিয়ে এসেছেন। বস্তুত এরপরও তাদের অনেক লোক পৃথিবীতে সীমা অতিক্রম করে (Al-Quran, ০৫:৩২)।”

কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে নিহত ব্যক্তি মুসলিম হোক অথবা অমুসলিম হোক হত্যাকারীকে শাস্তি ভোগ করতেই হবে। কুরআনের বিধান মতে নিহতের পরিবার হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিলে হত্যাকারী মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে তারা আর্থিক ক্ষতিপূরণ নিতে পারেন, আবার ক্ষমাও করে দিতে পারেন। কিসাসের বিধানটি ইসলামী আইনের একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। আধুনিক পশ্চিমা আইনেও এর বাস্তবতা লক্ষ্য করা যায়। কোনো অপরাধী যদি আন্তরিকভাবে অনুতপ্ত হয়, তাহলে তাকে একবার সুযোগ দেওয়ার বিধান এ আইনেও রয়েছে। যদি কেউ কাউকে হত্যা করে, তাহলে আদালত কর্তৃক তার শাস্তি কার্যকর হবে। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রের অনুমতি ছাড়া কোনো রায় প্রদান ও কার্যকর করতে পারে না।

ন্যায় বিচার ও আইনে দৃষ্টিতে সমতা

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রতি ইসলাম জোর তাগিদ দিয়েছে। ইসলামী আইনে অপরাধীকে অপরাধী হিসাবেই গণ্য করা হয়। ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, গোত্র, বংশ কিংবা অন্য কোনো পরিচয়ের কারণে কারও প্রতি অনুরাগ কিংবা বিরাগভাজন হওয়ার সুযোগ নেই। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাই এখানে মুখ্য। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

হলো উবাইদুল্লাহ ইব্ন উমর রা. এর মামলা। যে মামলার রায় দিলেন আমীরুল মু’মিনীন উসমান রা.। উমর রা. আহত হবার পরদিন সকালে উবাইদুল্লাহ ইব্ন উমর রা., উমর রা. এর হত্যাকারী আবু লুলুর কন্যার কাছে যান এবং তাকে হত্যা করেন। জুফাইনাহ নামক একজন খ্রিস্টানকে তিনি তলোয়ার দিয়ে আঘাত করে হত্যা করেন। তাসতুরের শাসক আল হুরমুজানকে তিনি আঘাত করে তাকেও হত্যা করেন। অভিযোগ করা হয়েছে যে, তারা এ দু’জন উমর রা. কে হত্যার ব্যাপারে আবু লুলুকে সাহায্য করেছিল (Ibn Kathir ১৯৮৮, ৭/১৬৭)”।

এ তিনজন ব্যক্তিই ছিল অমুসলিম। আহত উমর রা. তাদের হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শুনে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন এবং তাঁর পুত্রকে বন্দী করার হুকুম দিয়েছিলেন। যেন পরবর্তী খলীফা এর সুষ্ঠু বিচার করতে পারেন। উবাইদুল্লাহ ইব্ন উমর এই হত্যাকাণ্ডটি সংগঠিত করেছিলেন এমন অবস্থায়, যখন তাঁর পিতা তাদের ষড়যন্ত্রের কারণে আবু লুলুর দ্বারা ছুরিকাঘাতে আক্রান্ত হয়ে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে লড়ছেন। তাঁর এ হত্যাকাণ্ডের কারণ ছিল প্রতিশোধ গ্রহণ করা। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারী খলীফাগণ এ মর্মে কোনো আপস করেননি। সর্বাবস্থায় তাঁরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাই উসমান রা. খলীফা হয়েই এ ব্যাপারে ন্যায়ের সাথে ফায়সালা দেয়ার জন্য সাহাবায়ে কিরামের পরামর্শ কামনা করেন। আলী রা. বলেন, ‘আমার মত হলো তাঁকে হত্যা করা’। কিছু সংখ্যক মুহাজির বলেন, ‘গতকাল উমর রা. শহীদ হয়েছেন, আর আজ তাঁর পুত্রকে হত্যা করা হবে?’ তখন উসমান রা. খলিফা

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۟ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা ন্যায়বিচারে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত থাকবে আল্লাহর সাক্ষীস্বরূপ; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজনের বিরুদ্ধে হয়; সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীন হোক আল্লাহ উভয়েরই ঘনিষ্ঠতর। সুতরাং তোমরা ন্যায়বিচার করতে প্রবৃত্তির অনুগামী হয়ো না (Al-Quran, ০৪:১৩৫)।

সকলেই আইনের দৃষ্টিতে সমান ও আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী ও সকল মানুষের উপর আইনসমানভাবে কার্যকর হবে। উমর রা. এর হত্যার ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত সন্দেহে নিহত তিনজন অমুসলিম নাগরিকের হত্যাকাণ্ডের বিচারের ঘটনা। এর সাথে জড়িত হল সদ্য শাহাদাতপ্রাপ্ত খলীফা উমর রা. এর ছেলে উবাইদুল্লাহ ইব্ন উমর রা.। ইব্ন কাছীর রহ. এর বর্ণনায়, "উসমান রা. এর খিলাফতের প্রথম মামলাটি হিসেবে সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি দেখলেন, নিহত ব্যক্তিগণের কোনো উত্তরাধিকারী নেই। ইসলামের বিধান অনুযায়ী যার উত্তরাধিকারী নেই ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারই তার উত্তরাধিকারী হয়। তাই উসমান রা. নিজেই তাদের উত্তরাধিকারী। সাধারণত হত্যাকাণ্ডের বিচার সংগঠিত হয় নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীদের দাবি অনুসারে এবং এর শাস্তি হলো কিসাস অর্থাৎ হত্যাকারীকে হত্যা করা অথবা দিয়াত (রক্তপণ) দেয়া। উসমান রা. বললেন, "আমি তাদের অভিভাবক। আমি দিয়াত (রক্তপণ) নির্ধারণ করলাম এবং আমি আমার সম্পদ থেকেই তা আদায় করবো (Al-Tabari ১৩৮৭ঐ, ৪/২৩৯)"।

অপরাধের জন্য ধর্মীয় পরিচয় কিংবা ব্যক্তির অন্য যেকোনো পরিচয় আইন প্রয়োগে কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। যার ফলে সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

পারস্পরিক ধর্মবিশ্বাসকে অসম্মান না করা

সমাজে সম্প্রীতি বজায় রাখার সর্বোত্তম ব্যবস্থা হলো- কোনো সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ও রীতি-নীতির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন না করা। বরং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের ধর্ম বিশ্বাসের প্রতি পারস্পরিক সম্মানবোধ সমুন্নত রাখা উচিত। প্রত্যেক মানুষ সে যা পালন করে সেটাকে সর্বোচ্চ সম্মান করে থাকে। কারও ধর্ম বিশ্বাসকে অশ্রদ্ধা করা কিংবা কারও অনুভূতিতে আঘাত দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করা ইসলামের চেতনা পরিপন্থী কাজ। এ বিষয়ে অতএব,

فَذَكِّرْ ۗ إِنَّمَآ أَنْتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾

(হে নবী!) আপনি উপদেশ দিতে থাকুন, আপনি তো একজন উপদেশদাতা মাত্র। আপনি তো তাদের কর্মনিয়ন্ত্রক নন (Al-Quran, ৮৮:২১-২২)।

কুরআনে এরকম অনেক নির্দেশনা রয়েছে, যেখানে মানুষের বিশ্বাসের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা হয়েছে। একইভাবে অন্য ধর্মাবলম্বীদের আচার অনুষ্ঠান পালনের অধিকারকেও সংরক্ষণ করার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, তা'আলা ঘোষণা করেন,

وَ لَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যাদের উপাসনা করে তোমরা তাদের গালি দিও না, তাহলে তারাও অজ্ঞতাবশত আল্লাহকেও গালি দিবে (Al-Quran, ৬:১০৮)।

অমুসলিমরা যেসব কাজ তাদের ধর্মে হালাল বলে মনে করে ইসলাম তাদেরকে সেসব কাজ পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে না এবং তারা যেগুলোকে হারাম মনে করে তা পালন করতে তাদের উপর চাপ প্রয়োগ করে না। বরং ইসলামের দৃষ্টিতে সে সমস্ত কাজ অবৈধ হলেও তাদের ধর্মমতে চর্চা করতে পারবে। পবিত্র কুরআনে নবী স. কে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَ لَوْ لَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَ بِيَعٌ وَّ صَلَوٰتٌ وَّ مَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللهِ كَثِيْرًا

আল্লাহ যদি মানব জাতির একদলকে আরেকদল দিয়ে প্রতিহত না করতেন তাহলে ধ্বংস হয়ে যেতো খ্রিস্টান সংসার বিরাগীদের উপাসনালয়, গির্জা, ইয়াহুদীদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ যেখানে অর্ধেক পরিমাণে আল্লাহর নাম স্মরণ করা হয় (Al-Quran, ২২:৪০)।

এ আয়াতের শিক্ষা হলো, কোনো ধরনের ধর্মীয় নিপীড়ন চালানো নিকৃষ্ট কাজ। মুসলিম হোক কিংবা অমুসলিম হোক, প্রত্যেকেই স্ব-স্ব ধর্মকে হৃদয় দিয়ে (বল,)

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ

১. তোমাদের দীন তোমাদের জন্য এবং আমার দীন আমার জন্য (Al Quran, ১০৯:০৬)।

আল্লাহকে বাদ দিয়ে যারা অন্যদের উপাসনা করে, মূলত তা আল্লাহকে অস্বীকার করার শাামিল হলেও সমাজে সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য আল্লাহ তা'আলা মানুষকে পছন্দ অনুযায়ী ধর্ম পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। ভালোবাসে। এটি মানুষের আত্মপরিচয়কে নির্ণয় করে। কিন্তু বর্তমান সময় দেখা যাচ্ছে, কিছু কিছু মুসলিম নামধারী ব্যক্তি ভিন্ন মতাবলম্বীদের উপাসনালয়ে বোমা মারছে। ইসলামে এ সকল কর্মকাণ্ড সমর্থনযোগ্য নয়। এ কারণে নিষ্ঠাবান মুসলিমদের ইতিহাস হচ্ছে, সকল ধর্মের উপাসনালয়াগুলোর পূর্ণ নিরাপত্তা দানের ইতিহাস। কেননা, ধর্মীয় উপাসনালয়গুলোতে আল্লাহ তা'আলার নাম অধিক পরিমাণে স্মরণ করা হয়। প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীগণ আপন আপন আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, বিশ্বাস অনুযায়ী তাদের প্রভুকে স্মরণ করার জন্যই তাদের স্ব-স্ব উপাসনালয়ে গমন করেন। বলুন, সত্য তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكُمْ ۚ فَمَنْ شَآءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّ مَنْ شَآءَ فَلْيَكْفُرْ

অতএব, যার ইচ্ছা বিশ্বাস স্থাপন করুক এবং যার ইচ্ছা অমান্য করুক (Al-Quran, ১৮:২৯)।

অর্থাৎ কেউ চাইলে আল্লাহর সত্য বাণীর উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারে

সকল সম্প্রদায়ের কাছেই আল্লাহর বাণী

আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের কাছেই নবী প্রেরণ করেছেন। তাঁদের শিক্ষা ছিল এক ও অভিন্ন। আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন, তা অমান্যও করতে পারে। এর জন্য কাউকে আসামি সাব্যস্ত করা যাবে না। মুসলিমদেরকে অমুসলিমদের অভিভাবক হিসাবে দায়িত্ব দেয়া হয়নি। অমুসলিমদের কৃতকর্ম সম্পর্কে তাদেরকেই জবাবদিহি করতে হবে; মুসলিমদের নয়। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন,

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ

রাসূলদের কারো মধ্যে আমরা পার্থক্য করি না (Al-Quran, ০২:২৮৫)।

মানুষের ইহাকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তির উপায় সম্পর্কে অবহিত করাই এর মূল লক্ষ্য। দুনিয়াতে প্রেরিত সকল নবীদের শিক্ষা ছিল আল্লাহর একত্ববাদের প্রচার ও আল্লাহর আদেশ নিষেধের বাণী মানুষের মাঝে পৌঁছে দেয়া। মানুষ আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত এ জীবন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করলে সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে ওঠবে। কিন্তু মানুষ অন্যদের ধর্মীয় বিষয়ে জ্ঞানার্জন না করেই অহেতুক খারাপ ও মন্দ ধারণা পোষণ করে থাকে। অন্য ধর্ম সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করার কারণে খুব কম মানুষই

সহাবস্থান ও সদাচরণ

ইসলাম মানব জাতির সহাবস্থান ও সম্প্রীতির ভিত্তিতে পরিচালিত একটি জীবনব্যবস্থা। অমুসলিম সম্প্রদায় যদি মুসলিমদের সাথে শান্তিতে বসবাস করতে চায়, তাহলে ইসলামের মূলনীতি হলো শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বজায় রাখা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, অন্যদের সম্পর্কে জানতে আগ্রহী হয়। এমনকি স্ব-স্ব ধর্মের তাত্ত্বিক শিক্ষা গ্রহণ না করে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কিছু ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান আঁকড়ে ধরে রেখেছে। অন্য সম্প্রদায় সম্পর্কে অহেতুক নেতিবাচক ধারণা পোষণ না করে পরস্পরকে জানার ও বোঝার চেষ্টা করলে এবং স্ব-স্ব ধর্মগ্রন্থের মৌলিক কথাগুলো মেনে চললে সমাজের সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও সহিংসতা বন্ধ হয়ে মানুষ ধর্মীয় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একটা কাছাকাছি অবস্থানে চলে আসতো। সকলেই সকলকে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারতো। কারণ, পৃথিবীর প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছেই আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَ لَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَ تُقْسِطُوْۤا اِلَيْهِمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿۸﴾

যারা দীনের ব্যাপারে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে বাড়িঘর থেকে বের করে দেয়নি তাদের প্রতি সদাচরণ ও ন্যায়বিচার করতে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নিষেধ করেন না নিশ্চই আল্লাহ তা'আলা ন্যায়পরায়ণ লোকদের ভালোবাসেন (Al-Quran, ৬০:০৮)।

কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা বা বাড়ি ঘর থেকে বের করে দেওয়া একেবারে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবেই বিবেচিত। তাই এ ধরণের কর্মকাণ্ডের সাথে যে সকল অমুসলিম জড়িত নেই তাদের প্রতি সদয় ও সহাবস্থানের কথা মুসলিমদের জানিয়ে দেয়া হয়েছে।

وَ لَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَ اجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ

আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছি এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগুতকে বর্জন কর (Al-Quran, ১৬:৩৬)।

তারপরও মানুষ নিজেদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে উপহাস করে। যেমন আল-কুরআনে এসেছে,) সমাজে বসবাসকারী অমুসলিদের সাথে সামাজিক কাজকর্ম যেমন উঠা-বসা, লেনদেন, খানাপিনা ও উপহার সামগ্রী আদান প্রদান ইত্যাদি সম্পাদন করা ইসলামে নিষিদ্ধ নয়। এসকল কাজকর্ম মানুষের মাঝে ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক বৃদ্ধি করে। নবী মুহাম্মদ স. বিভিন্ন সময় অমুসলিমদের কাছ থেকে উপহার সামগ্রী গ্রহণ করেছেন এবং তাদের জন্য উপহার

পাঠিয়েছেন। অমুসলিমদের তৈরি খাবার তিনি গ্রহণ করেছেন। তাদের দাওয়াত কবুল করেছেন। তাদের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য করেছেন। অর্থাৎ ইহুদিরা বলে, খ্রিস্টানরা কোনো কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। আবার খ্রিস্টানরা বলে ইহুদিরা কোনো কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। অথচ তারা উভয় সম্প্রদায়ই কিতাব তেলাওয়াত করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ قَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَىْءٍ ۪ وَّ قَالَتِ النَّصٰرٰى لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَىْءٍ ۙ وَّ هُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ

(Al-Quran, ০২:১১৩)।

এ আয়াতের মর্মার্থ হলো- অন্ধভাবে অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষপ্রবণ না হয়ে দৈনন্দিন জীবনের বৈধ সকল ধরনের কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন। যেমন হাদীসে এসেছে, কাবীসা ইব্‌ন হুল্‌ব র. থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (পিতা) বলেন, আমি নবী স. কে নাসারাদের তৈরি খাবার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম,

لَا يَتَخَلَّجَنَ فِيْ صَدْرِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيْهِ النَّصْرَانِيَّةَ

তিনি বললেন: সকল ধর্মের সাদৃশ্যগুলোকে মেনে নিতে হবে। যাকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মূলমন্ত্র হিসাবে উল্লেখ করা যায়। আল কুরআনে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কোনো খাদ্য সম্পর্কে তোমার মনে অযথা সন্দেহ ও দ্বিধা-সংকোচ সৃষ্টি হওয়া ঠিক নয়। এ ধরনের অমূলক সংশয়ে পতিত হলে তুমি নাসারাদের বলো, হে কিতাবীগণ! এসো সেই কথার দিকে, যা আমাদের ও তোমাদের মাঝে একই (Al-Quran, ০৩:৬৪)। (Al-Tirmidi ১৪১৭ঐ, ৩৭১, ১৫৬৫; Abu Daud ১৪২০ঐ, ৪১৭, ৩৭৮৪)।

তবে যেসকল খাদ্য ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ কেবল সে খাবার গ্রহণ করা মহান আল্লাহ আরো বলেন, যাবে ,আর যেসকল খাদ্য তাদের বিধানে বৈধ; কিন্তু ইসলামে অবৈধ তা স্বাভাবিক অবস্থায় গ্রহণ করা যাবে না। যেমন মদ, শূকরের মাংস ইত্যাদি। তিনি অমুসলিমদের সাথে সর্বদা সদাচরণ করেছেন। তারা নবী স. কে বিভিন্নভাবে অমানুষিক কষ্ট ও যন্ত্রণা দিলেও নবী স. তাদের থেকে প্রতিশোধ নেননি। এমনকি তাদের অভিশাপও দেননি। বরং তাদের হিদায়াতের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করেছেন। নবী মুহাম্মদ স. এর এসকল কর্মকাণ্ড সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানের নির্দেশনা প্রদান করে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

قُلْ لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامَ اللّٰهِ لِيَجْزِىَ قَوْمًۢا بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿۱۴﴾

ঈমানদারদেরকে তুমি বলো, যারা আল্লাহ তা'আলার দিবসগুলোর প্রত্যাশা করে না, তারা যেন তাদের ক্ষমা করে দেয়, এটি এজন্য যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক সম্প্রদায়কে তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান দিবেন (Al-Quran, ৪৫:১৪)।

মক্কা বিজয়ের প্রাক্কালে মহানবী মুহাম্মদ স. মক্কাবাসীদের ক্ষমা করে পৃথিবীর ইতিহাসে উদারতার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এ সময়ে এক ফোঁটা রক্তও ঝরেনি। সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মদ স.-এর জীবনাদর্শই মাইলফলক। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও ক্ষমার নীতি অবলম্বন

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য ইসলামে উদার দৃষ্টিভঙ্গী ও ক্ষমার রীতি রয়েছে। কেননা, আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন হলেন পরম করুণাময় ও দয়াশীল। আল্লাহর ইচ্ছা পৃথিবীর বুকে সকল মানুষ মিলেমিশে শান্তিতে বসবাস করুক। তাইতো তিনি রাসূল স. এবং মুসলমানদেরকে উদার হৃদয়ের, কোমল স্বভাবের এবং সহিষ্ণু হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ মহানবী মুহাম্মদ স. কে নবুওয়াতের যে মহান দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তাতে কিছু মানুষ ঈমান আনবেন আর কিছু মানুষ এর বিরোধী হবে এটাই স্বাভাবিক। এ অবস্থায় তাঁর কর্তব্য সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, তাকে নিজের সঙ্গী-সাথীদের প্রতি স্নেহশীল, সাধারণ মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র হৃদয় এবং নিজের বিরোধীদের প্রতি সহনশীল ও সহিষ্ণু হতে হবে। বিরোধীদের কঠোর ব্যবহারকে সহ্য করে তাদের বিরক্তিকর ও অপছন্দীয় কথাগুলোও উদার মনে এড়িয়ে যেতে হবে। তারা যত খারাপ ব্যবহারই করুক না কেন, যতই বর্বর হোক না কেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

ইসলামের আদর্শ রাসূলের জীবনেই তোমাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম আদর্শ (Al-Quran, ৩৩:২১)।

ইসলামী জীবন বিধানের সর্বত্র উদারতা ও নৈতিকতার ছাপ বিদ্যমান। একজন মুসলিম তার দৈনন্দিন কাজ কর্মে যেমন নিষ্ঠাবান হবেন, তেমনি নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনেও হবেন সদা সচেষ্ট। একইভাবে তার চিন্তা-চেতনায় মানুষের কল্যাণ, মানুষের সেবা ও মানব প্রেমের প্রতিফলন থাকবে। কেননা, এর মধ্যেই মুমিন জীবনের স্বার্থকতা ও কল্যাণ নিহিত। একজন মুমিনের জীবনে মানুষের সাথে উঠা-বসা, লেনদেন ও আচার ব্যবহারে ইসলামের সুমহান আদর্শের প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়। একজন মুসলিমের জীবনযাপনে প্রকাশ পায় সুন্দর ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচার আচরণ, বন্ধুভাবাপন্ন স্বভাব, পরিচ্ছন্ন লেনদেন, প্রতিবেশীর প্রতি সদ্ব্যবহার এবং উদার মানবিকতা। এই উদারতার প্রকাশ ঘটেছে মুশরিক পিতা-মাতা যখন মুসলিম সন্তানকে শির্ক ও কুফরীর দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালায় তখন তাদের সাথে করণীয় প্রসঙ্গে অবতীর্ণ আয়াতে। এ প্রসঙ্গে হলো- কঠোর প্রতিক্রিয়া, কর্কশ আচরণ ও বর্বরোচিত প্রতিশোধ না নিয়ে কুরআনের নির্দেশ হলো তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা। তাদের সকল কর্মকাণ্ড ধৈর্য্যের সাথে সহ্য করে উদারতার পরিচয় দিয়ে আল্লাহর উপর ভরসা করে ক্ষমা করে দেয়া। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে বলেন,

وَ صَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوْفًا

আর পৃথিবীতে তাদের সাথে সৎভাবে বাস করবে (Al-Quran, ৩১:১৫)।

মুসলিমদের উদারতা ও গুণাবলি বর্ণনায় আল কুরআনে বলা হয়েছে

خُذِ الْعَفْوَ وَ اْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ اَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿۱۹۹﴾

তুমি ক্ষমার নীতি অবলম্বন করো, নেক কাজের আদেশ দাও এবং মূর্খ লোকদের এড়িয়ে চলো (Al-Quran, ৭:১৯৯)।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَ يُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّ يَتِيْمًا وَّ اَسِيْرًا ﴿۸﴾ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ

لَا شُكُوْرًا ﴿٩﴾

আহারের প্রতি তাদের আসক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, এয়াতীম ও বন্দিকে খাদ্য প্রদান করে এবং বলে কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে।

আমরা তোমাদের খাদ্য দান করি, আমরা তোমাদের নিকট থেকে কোনো প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয় (Al-Quran, ৭৬:০৮-০৯)।

এখানে বন্দি বলতে অমুসলিম বন্দিদেরকে বুঝানো হয়েছে। অমুসলিম পাড়া প্রতিবেশীদের সাহায্য সহযোগিতার বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন,

يْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَ لٰكِنَّ اللهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ؕ وَ مَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ اللهِ ؕ وَ مَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَ اَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٢﴾

যে ধন সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তার পুরস্কার তোমাদের পুরোপুরি প্রদান করা হবে এবং তোমাদের প্রতি অন্যায় করা হবে না (Al-Quran, ০২:২৭২)।

যে ব্যক্তি মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায় এবং দল থেকে পৃথক হয়ে যায় অতঃপর মৃত্যুবরণ করে সে যেন জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করলো। যে ব্যক্তি ক্রোধের বশবর্তী হয়ে অন্ধ অনুসরণ করে যে ধন-সম্পদ তোমরা ব্যয় কর তা তোমাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য এবং তোমরা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই ব্যয় করে থাক।

উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনা নিষিদ্ধঃ

ইসলামে উগ্র জাতীয়তাবাদী চেতনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ইসলাম মধ্যমপন্থার জীবনব্যবস্থা, যার মূলনীতি অত্যন্ত উদার ও গণতান্ত্রিক। উগ্রবাদী আচরণ কিংবা উগ্রবাদী কোনো পন্থা গ্রহণ করার সুযোগ ইসলামে নেই। জাতীয়তার উগ্র চেতনা মানুষদেরকে সহিংসতা ও সংঘাতের দিকে নিয়ে যায়। সমাজের শান্তি ও সম্প্রীতি বিনষ্ট হয়। মহানবী স. উগ্রবাদী জাতীয়তাবাদের মূলে কুঠারাঘাত করে বিদায় হজ্জের ভাষণে স্পষ্ট ঘোষণা করেন, হে মানবমণ্ডলী! জেনে রাখ, তোমাদের প্রভূ একজন, তোমরা সকলেই এক পিতার সন্তান। আরও জেনে রাখ, কোনো অনারবের ওপর আরবের বা আরবের ওপর অনারবের মর্যাদা নেই। একইভাবে কালো বর্ণের মানুষের ওপর লাল বর্ণের মানুষের বা লাল বর্ণের মানুষের ওপর কালো বর্ণের মানুষের মর্যাদা নেই, শুধুমাত্র তাকওয়ার ভিত্তি ছাড়া (Ahmad ND. ৫/৪১১, ২৩৫৩৬)।

আল্লাহর কাছে মানুষের মর্যাদার মানদণ্ড হলো তাকওয়া বা পরহেযগারী। মানুষের মাঝে গঠনগত, ভাষাগত, চিন্তা-চেতনাসহ নানা দিকে পার্থক্য থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং এটা আল্লাহর সৃষ্টির এক অনুপম সৌন্দর্য হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু মানুষের মাঝে এ পার্থক্য নিয়ে কোনো প্রকার জাতীয়তাবাদের উগ্র প্রকাশ গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন মুহাম্মদ স. ঘোষণা করেন,

من خرج من الطاعة وفاق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقلتة جاهلية و من خرج على أمتى يضرب برها وفاجرها ولا يتحاش من مؤمنها وال يفى لذي عهد عهده فليس مني ولست منه

জাতীয়তাবাদের জন্য যুদ্ধ করে অথবা জাতীয়তাবাদের দিকে আহ্বান করে অথবা জাতীয়তাবাদকে সাহায্য করে অতঃপর নিহত হয়, তাঁর মৃত্যুও যেন জাহেলিয়্যাতের ওপর হলো। আর যে ব্যক্তি বিদ্রোহ করে আমার উম্মতের ভালো-মন্দ নির্বিশেষে সকলকেই আঘাত করে, মুমিন ব্যক্তিকে ভয় করে না এবং (নিরাপত্তার) চুক্তিতে আবদ্ধ লোকদের অঙ্গীকার যথাযথভাবে পূরণ করে না, সে আমার কেউ নয় এবং আমিও তার কেউ নই (Muslim ২০০৬, ৮৯৭, ১৮৪৮)।

ইসলামের এ চেতনা সমাজ থেকে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প চিরতরে বিদায় করে দিয়ে একটি সৌহার্দ ও সম্প্রীতির সমাজ গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

বৈষম্যহীন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সামাজিক নিরাপত্তাঃ

অর্থনৈতিক বৈষম্য সমাজে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। তাই সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য ইসলাম প্রদত্ত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বৈষম্যহীন ও ইনসাফপূর্ণ। এখানে মুসলিম কিংবা অমুসলিম সকলেই বৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন, ভোগ কিংবা হস্তান্তরের পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করে থাকে। সম্পদ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে হলে প্রত্যেক নাগরিককে নির্দিষ্ট হারে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে অর্থ প্রদান করতে হয়। মুসলিমরা এ অর্থ প্রদান করে যাকাত ব্যবস্থাপনার আওতায়। আর অমুসলিমরা প্রদান করবে জিযিয়া (কর) ব্যবস্থাপনার আওতায়। উভয় ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্য হলো সমাজের দারিদ্র্য দূরীকরণ, আয় বৈষম্য কমানো ও মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। মুসলিম ধনিক শ্রেণির উপর যাকাত একটি ফরয ইবাদত। নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী একজন মুসলিম প্রতি বছর তার সম্পদের হিসাব করে চল্লিশ ভাগের একভাগ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দিবেন। রাষ্ট্র এ অর্থ দ্বারা সমাজের দরিদ্র ও অভাবী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করবে। যাকাতের অর্থ কেবলমাত্র মুসলিম ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হবে। কিন্তু ব্যয়ের জন্য খাত সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেখানে মানুষের ধর্মের পরিচয়কে বিবেচনা না করে নির্দিষ্ট কিছু গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যারা এ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত তারা সকলেই যাকাতের অর্থের মাধ্যমে সুবিধা পাবেন। যেমন আল-কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে, ভাষণসমূহে বিশ্বময় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার দিক-নির্দেশনা ও আহ্বান রয়েছে। তৎকালীন বিশ্বে জাতিভেদ, জাত্যাভিমান, উঁচু-নিচুর পার্থক্য ও ছোট বড়র তারতম্য ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। রাজার সামনে প্রজা, ধর্মগুরুর সামনে সাধারণ মানুষ, অভিজাত সম্প্রদায়ের কাছে নীচ বংশীয় লোকেরা ছিল তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের পাত্র। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ হজ্জের মাধ্যমে জাহেলী সমাজের নিয়ম পদ্ধতির বিলোপ সাধনে উদ্যোগী হন। সকলের মধ্যে সমতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তিনি কুরাইশ-অকুরাইশ নিশ্চয়ই সাদাকাসমূহ দরিদ্র, নিঃস্ব, যাকাত আদায়ে কর্মরত ব্যক্তি, ইসলামের প্রতি যাদের মন আকৃষ্ট করার প্রয়োজন, দাসমুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে এবং মুসাফিরের জন্য। আল্লাহ তাআলা বলেন.

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسٰكِيْنِ وَ الْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَ فِى الرِّقَابِ وَ الْغٰرِمِيْنَ وَ فِىْ
سَبِيْلِ اللهِ وَ ابْنِ السَّبِيْلِ ؕ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ ؕ وَ اللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۶۰﴾

(Al-Quran, ০৯:৬০)।

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা যাকাতের অর্থ ব্যয়ের খাতগুলো মধ্যে একটি খাত অমুসলিমদের জন্যই নির্দিষ্ট করেছেন। সেটি হলো ‘মুআল্লাফাতু কুলুবুহুম’ অর্থাৎ সে সকল অমুসলিম ব্যক্তি ইসলামের প্রতি যাদের আকৃষ্ট করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ইসলামের অন্যান্য যে সকল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু আছে সমাজের গোটা মানবগোষ্ঠীই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন সাদাকাহ বা ‘নিঃস্বার্থভাবে স্বেচ্ছায় দান কার্যক্রম’। যেকোনো অভাবী বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করার দিকনির্দেশনা ইসলামে রয়েছে।

তাছাড়া রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত যে কোনো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় মুসলিম অমুসলিম সকলেই অন্তর্ভুক্ত হবেন। যেমন একদিন উমর রা. একজন ইয়াহুদী বৃদ্ধকে ভিক্ষা করতে দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন। তাকে সাথে নিয়ে গিয়ে বায়তুল মাল হতে নিয়মিত ভাতার ব্যবস্থা করে দিলেন। জীবিকা উপার্জনে অক্ষম অমুসলিম ও মুসলিম নাগরিকদের বৃত্তি প্রদানে তিনি কোনোরূপ বৈষম্য করতেন না। বরং অমুসলিমদের বেলায় বেশি উদার মনোভাব দেখাতেন (Nu‘mani ২০১২, ২০২)।

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার নীতি এমনভাবে গ্রহণ করা হয়, যেখানে অমুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি বৈষম্য তো নয়ই, বরং যা করলে ইসলামের প্রতি তাদের আকর্ষণ সৃষ্টি করা যায় সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা হয়, যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

বিদায় হজ্জের ভাষণে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঐতিহাসিক ঘোষণাঃ

দশম হিজরীতে নবী স. তার জীবনের সর্বশেষ হজ্জ পালন করেন। এ হজ্জ পালনকালে বিশ্ব মুসলিমের সমবেত সভায় প্রদত্ত ভাষণে তিনি ইসলামের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করেন। হজ্জের এই নির্বিশেষে সকল হজ্জযাত্রীদেরকে নিয়ে আরাফাতের ময়দানে ৯ যিলহজ্জ তারিখে সমবেত হলেন। উপস্থিত জনতার সম্মুখে ঘোষণা দিলেন,

ألا كل من امر الجاهلية تحت قدمي موضوع

জাহেলী যুগের সমস্ত রীতি-প্রথা আমার পদতলে নিহিত (Muslim ২০০৬, ৫৫৭, ১২১৮)।

পৃথিবীর সকল মানুষের প্রতি আহ্বান জানালেন, এক পিতা-মাতার সন্তান হিসেবে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতাকে ধূলিসাৎ করা হলো। সমস্ত জাতিভেদ ও অসাম্যের মাথায় কুঠারাঘাত করলেন। আবু নাযরাহ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আইয়্যামে তাশরীকের মধ্যবর্তী সময়ে রাসূল স.-এর ভাষণে তিনি শুনেছেন। সে ভাষণে তিনি বলেছিলেন,

يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد ألا لا فضل لعبي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأخمر على أسود على إلا بالتقوى

হে মানবজাতি! নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভু এক। তোমাদের পিতা এক। সাবধান! অনারবের উপর আরবের কিংবা আরবের উপর অনারবের, কালো বর্ণের উপর লাল বর্ণের কিংবা লাল বর্ণের উপর কালো বর্ণের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই। শ্রেষ্ঠত্বের ভিত্তি হচ্ছে কেবলমাত্র আল্লাহ ভীতি (Ahmad ND. ৫/৪১১, ২৩৫৩৬)।

জাহেলী যুগে কোনো গোত্রের কোনো ব্যক্তি অন্য গোত্রের কারো দ্বারা নিহত হলে এর প্রতিশোধ গ্রহণ করাকে তারা বংশগত কর্তব্য মনে করতো। এমনকি শত শত বৎসর অতীত হলেও তারা এই কর্তব্য পালনে বদ্ধপরিকর থাকতো। ফলে তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, হানাহানি, কাটাকাটি, যুদ্ধ বিগ্রহ ছিল নিত্তনৈমিত্তিক ব্যাপার। মানবতার মুক্তির দূত নবী মুহাম্মদ স. এই জঘন্য প্রথার মূলোৎপাটন করার জন্য দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা দেন, জাহেলী যুগের সমস্ত খুন (অর্থাৎ প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার) বাতিল করা হলো। আমি সর্বপ্রথম আমাদের যে খুনের প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার বাতিল করলাম তা হলো রবী'আ ইব্‌ন হারিসের পুত্রের খুনের প্রতিশোধ। সে যখন বনী সা'আদ গোত্রে লালিত পালিত হচ্ছিল তখন হুযাইলের এক ব্যক্তি তাকে হত্যা করে। রাসুল (সাঃ) বলেন,

ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني فقتلته هذيل

(Muslim ২০০৬, ৫৫৮, ১২১৮)।

মানুষের মধ্যে অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্রধান কারণ বংশগত হানাহানি ও নির্দেশনা প্রদান করে এবং এমন এক সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালায়, যেখানে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হবে।

ইসলামী আইনে জোর জবরদস্তি নিষিদ্ধ

ইসলামী আইনে জোর-জবরদস্তি হারাম। কেননা, বিশ্বাসের বিষয়গুলো মানুষের অন্তরের সাথে সম্পর্কিত। তাই জোর-জবরদস্তি করে কারো মনের বিশ্বাস পরিবর্তন করা যায় না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, বর্ণবাদ। যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বড় অন্তরায়। এ থেকে মানুষকে রাখতে তিনি ঘোষণা দিলেন, পুত্র দায়ী নয় এবং পুত্রের অপরাধের জন্যও পিতা দায়ী নয় (Al-Tirmidi ১৪১৭ঐ, ৪৮৮, ২১৫৯)"।

আরও বলেন, কোন গোলামকেও যদি তোমাদের নেতা নির্বাচন করা হয় এবং সে দীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। নিঃসন্দেহে হিদায়াত গোমরাহী থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই যে ব্যক্তি তাগুতকে অমান্য করবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে, সে ধারণ করে নিয়েছে সুদৃঢ় হাতল, যা ভাঙবার নয়। আল্লাহ তা'আলা সবই জানেন এবং শুনেন।

لَاۤ اِكۡرَاهَ فِى الدِّيۡنِ ۙۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَ يُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى * لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَ اللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥٦﴾

(Al-Quran, ০২:২৫৬)।

অন্য আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মহানবী মুহাম্মদ স. কে উদ্দেশ্য তোমাদেরকে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী পরিচালনা করে তবে তোমরা তাঁর করে বলেন, কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করবে (Muslim ২০০৬, ৮৯২, ১৮৩৮)।

সর্বোপরি বিদায় হজ্জে প্রদত্ত ভাষণে নবী মুহাম্মদ স. পৃথিবীর সমস্ত মানুষের সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা প্রদান করেন। তিনি অন্যায়ভাবে কোনো ব্যক্তির জীবন নাশ, সম্পদ হরণ ও ইজ্জত সম্ভ্রম লুণ্ঠনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। আবু নাযরাহ বলেন, "রাসূল স. (উপস্থিত জনতাকে) জিজ্ঞেস করলেন, আজ কোন দিন? তাঁরা বলল, পবিত্র দিন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কি মাস? তাঁরা উত্তর দিল, পবিত্র মাস। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন শহর? তারা বলল, পবিত্র শহর। তিনি বললেন, নিশ্চয় তোমাদের পরস্পরের জন্য পরস্পরের জীবন, সম্পদ ও সম্ভ্রম মর্যাদাপূর্ণ, যেমন তোমাদের এই পবিত্র শহরে, এই পবিত্র মাসে আজকের দিনটি পবিত্র ও মর্যাদাপূর্ণ (Al-Bukhari ২০০২, ৪১৯, ১৭৩৯)।

এরপর তিনি সমস্ত মানুষকে আখেরাতের জবাবদিহিতাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে সম্প্রদায়িক দাঙ্গা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। এভাবেই ইসলামের সমস্ত বিধিবিধান সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও সংঘাতের মূলোৎপাটনের। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়;

فَاِنْ اَعْرَضُوْا فَمَاۤ اَرْسَلْنٰكَ عَلَيْهِمْ حَفِيْظًا ؕ اِنْ عَلَيْكَ اِلَّا الْبَلٰغُ

তবে আপনাকে আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। আপনার কর্তব্য কেবল প্রচার করা (Al-Quran, ৪২:৪৮)।

আল্লাহ তা'আলা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে মানুষকে স্বাধীনতা প্রদান করেছেন। তিনি পবিত্র কুরআনে মানুষের কাছে ইসলামের দাওয়াত প্রদান করেছেন, যেন মানুষ তাদের বিবেক, প্রজ্ঞা ও মেধা দিয়ে ইসলাম গ্রহণ করার সুযোগ পায়। ইসলামী দাওয়াতের মূলনীতি হলো "কাউকে জবরদস্তি করে ইসলামে প্রবেশের চেষ্টা না করা। জোর-জবরদস্তি করে কোনো কিছু কারো উপর চাপিয়ে দিলে সে সুযোগ

বুঝে তা প্রত্যাখ্যান করে। এমনকি দা'ঈর ক্ষতিও করতে পারে। কারণ, মানব অন্তঃকরণের স্বাভাবিক নীতি হলো, যে তার প্রতি ভলো আচরণ করল, সদয় হলো, তাকে সে ভালোবাসে, আর যে জবরদস্তি করল, তাকে সে ঘৃণা করে। ঐ জবরদস্তিকারী যে কেউ হোন না কেন (Anwari ২০০৫, ২৫০)।

এর ব্যতিক্রম কিছু হলে একদিকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট হবে, অন্যদিকে আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন হবে। ইসলাম প্রচারের অন্যতম একটি পন্থা হলো, অমুসলিমদের সাথে যুক্তিনির্ভর বিতর্ক করা। কারণ, এর মাধ্যমে মানুষের মধ্য হতে গোঁড়ামি দূরীভূত হয়। সত্য গ্রহণের জন্য মন তৈরি হয়। পারস্পরিক সম্পর্ক বৃদ্ধি পায়। সম্প্রীতি ও সৌহার্দপূর্ণ সামাজিক পরিবেশ গড়ে ওঠে। কারণ, প্রত্যেকটি সম্প্রদায়ের মানুষের রয়েছে নিজস্ব আকীদা ও বিশ্বাস। যেগুলো দীর্ঘ অনুশীলনের কারণে সেসকল রীতি-নীতির প্রতি ঐ সম্প্রদায়ের গভীর সম্পর্ক ও বিশ্বাস তৈরি হয়েছে। প্রত্যেকেই চায়, তার মতাদর্শকে যেকোনো দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে। আল্লাহ প্রদত্ত সর্বশেষ বিধানের প্রতি যারা এখনও বিশ্বাস স্থাপন করেনি তারা যে ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি লালন করছে তা প্রমাণ করার জন্য তাদের সাথে বিতর্ক করা যাবে, যদি তারা বিতর্কের জন্য আহ্বান করে। এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, যারা আপনার উপর অবতীর্ণ কিতারের উপর ঈমান আনয়ন করে এবং আপনার পূর্বে যে সকল কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে (Al-Quran, ০২:০৪)।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, আল্লাহর পক্ষ হতে যা তোমার নিকট অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা তোমার পূর্ববর্তী রাসূলগণের উপর অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর ঈমান রাখে এবং রাসূলগণের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না এবং তাদের কাছে তাদের প্রভুর পক্ষ থেকে যা এসেছে তা অস্বীকার করে না (Ibn Kathir ১৯৯৯, ১/১৭১)।

বিতর্ক করো উত্তম পন্থায়

একজন মুসলিমের এরূপ বিশ্বাসের কারণে কোনো অবস্থাতেই ভিন্ন মতাবলম্বীদের বা অন্য ধর্মে বিশ্বাসী ব্যক্তি কিংবা সম্প্রদায়কে অমর্যাদা কিংবা অসম্মান করতে পারে না। ইসলাম গোটা মানব জাতির বৃহত্তর ঐক্যে বিশ্বাসী। তাই একজন মুসলিম যেমন মুহাম্মদ স.-এর উপর ও তার প্রতি অবতীর্ণ তুমি তোমার রবের পথে প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা আহ্বান কর এবং বিতর্ক করো উত্তম পন্থায়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ جَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِىَ اَحْسَنُ

(Al-Quran, ১৬:১২৫)।

এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মূলত এ আদেশ প্রদান করেছেন, যারা এখনও ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করার সুযোগ পায়নি তাদের সাথে যুক্তিনির্ভর বিতর্কে অংশগ্রহণ করে সুন্দর ভাষায় ভদ্রভাবে কিতাব আল-কুরআন এর উপর ঈমান আনবে, একইভাবে অন্যান্য সকল ঐশী গ্রন্থের উপর বিশ্বাস স্থাপন করবে। এছাড়াও পবিত্র কুরআনে আরো অনেক আয়াত আছে, যেগুলো অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথে হিংসা, বিদ্বেষ, ঝগড়া, ফাসাদ পরিত্যাগ করে বিশেষভাবে মানবজাতির ঐক্য গঠনের যে নির্দেশনা দিয়েছে তা লক্ষণীয়। যেমন- আল-কুরআনের নির্দেশনা- শান্তি, সম্প্রীতি ও মুক্তির পথ ইসলামের দিকে আহ্বান জানাও। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা ইবনে কাছীর বলেন মুমিনগণ আপনার উপর অবতীর্ণ গ্রন্থ এবং আপনার পূর্ববর্তী রাসূলগণের উপর অবতীর্ণ গ্রন্থাবলির ওপর ঈমান আনে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالْمُؤْ مِنُوْنَ يُئْمِنُوْ بِمَآ أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ

(Al-Quran, ০৪:৬২)।

আল্লাহ তা'আলা আরো ঘোষণা করেন, তাদের মধ্য হতে যে ব্যক্তি বিতর্ক করতে চায় তার সাথে তা হবে সুন্দর ভঙ্গিতে, নম্র-ভদ্রভাবে এবং সুন্দর ভাষায় (Ibn Kathir ১৯৯৯, ৪/৬১৩)।

কেননা, সমাজের সম্প্রীতি রক্ষা করা ইসলামী আইনের অন্যতম চেতনা। সকল নবী-রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের নির্দেশনা ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পূর্ববর্তী সকল নবী ও তাদের উপর প্রেরিত আসমানী নির্দেশনার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমন আল্লাহ তা'আলার বাণী:

وَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَ مَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ وَ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ؕ﴿۴﴾

বলুন, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর উপর এবং যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের উপর, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তাঁদের সন্তানবর্গের উপর, আর যা কিছু পেয়েছেন মূসা ও ঈসা এবং অন্যান্য নবী রাসূলগণ তাঁদের পালনকর্তার কাছ থেকে। আমরা তাদের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর আমরা তাঁরই অনুগত (Al-Quran, ০৩:৮৪)।

উস্কানিমূলক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ

মানুষের মাঝে কোনো প্রকার হিংসা বিদ্বেষ ছড়ায় এরূপ কর্মকাণ্ড, আচার ব্যবহার ও কথাবার্তা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সকল সম্প্রদায়ের মানুষ সৌহার্দ ও সম্প্রীতির সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে এটাই ইসলামের বিধান ও আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ। তাই মহান আল্লাহ তা'আলা কোনোরূপ সংঘাত ও সহিংসতায় উস্কানি দেয়া নিষিদ্ধ করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, একে অপরকে অহেতুক দোষারোপ না করা, কোনো ব্যক্তিকে মন্দ নামে আখ্যায়িত না করা। কেননা, এতে যে কোনো ব্যক্তি তার প্রতি বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে। এছাড়াও আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাদেরকে অযথা কারো সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করা হতে, অপবাদ দেয়া ও গীবত করা হতে বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছেন, অনুরূপ অন্যের গোপন দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করতেও নিষেধ করেছেন। এ বিষয়ে রাসূল স. বলেছেন তোমরা কু-ধারণা হতে বেঁচে থাক, কু-ধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। তোমরা কারও গোপন তথ্য সন্ধান করো না। একে অপরের দোষ-ত্রুটি খোঁজার চেষ্টা করো না, পরস্পরে হিংসা করো না, একে অপর থেকে পৃথক থেকো না এবং একে অপরের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করো না। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা সবাই ভাই ভাই হয়ে যাও (Al-Bukhari ২০০২, ১৫১৯, ৬০৬৪)।"

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَ لَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰۤى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَ لَا تَلْمِزُوْۤا اَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ ؕ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ۚ وَ مَنْ لَّمْ يَتُبْ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿۱۱﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۫ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّ لَا تَجَسَّسُوْا وَ لَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۲﴾

হে ঈমানদারগণ, তোমাদের এক সম্প্রদায় যেন অন্য সম্প্রদায়কে উপহাস না করো। এমনও তো হতে পারে-যাদের উপহাস করা হয় তারা উপহাসকারীদের চেয়ে উত্তম। আবার নারীরাও যেন নারীদের উপহাস না করে, হতে পারে যাদের উপহাস করা হয়, তারা উপহাসকারিণীদের চেয়ে উত্তম। তোমরা একে অন্যকে দোষারোপ করবেনা এবং মন্দ নামে ডাকবে না। ঈমান আনার পর কাউকে খারাপ নামে ডাকা একটি বড় অপরাধ। যারা এ আচরণ থেকে ফিরে না আসবে তারা জালিম।

إياكم والظن فأن الظن أكذب الحديث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونو عباد الله إخوانا.

হে মুমিনগণ, তোমরা কুধারণা করা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কতক ধারণা গোনাহ এবং কারো গোপনীয় বিষয় সন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারো পশ্চাতে নিন্দা আন্তঃ-সাম্প্রদায়িক সংলাপ সমাজে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য আন্তঃধর্মীয় সংলাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সংলাপ ও পারস্পরিক আলোচনার প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ ধর্ম বিশ্বাসে গোঁড়ামি ও মূর্খতার কোনো স্থান নেই। কারণ সংলাপের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটে এবং মানুষের কাছে সত্য উদ্‌ঘাটিত হয়। আন্তঃ-ধর্মীয় সংলাপের ধারণাটি মূলত আল-কুরআনের মাধ্যমে পাওয়া যায়। যেখানে আল্লাহ তা'আলা কিতাবী সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে বলছেন, না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করা পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা তো একে ঘৃণাই কর। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু (Al-Quran, ৪৯:১১-১২)।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাফিজ ইমাদুদ্দীন বলেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করতে এবং তাদের নিয়ে ঠাট্টা-উপহাস করতে নিষেধ করেছেন। কারণ, মানুষ যাকে লাঞ্ছিত-অপমানিত করছে এবং উপহাসের পাত্র মনে করছে সেই হয়তো আল্লাহ তা'আলার নিকট বেশি মর্যাদাবান। পুরুষদেরকে এ কাজ থেকে নিষেধ করার পর পৃথকভাবে নারীদেরকেও নিষেধ করেছেন (Ibn Kathir ১৯৯৯, ৭/৩৭৬)।

এরপর আল্লাহ তা'আলা মানুষে মানুষে দ্বন্দ্ব তৈরী হয়, একজনের প্রতি অন্যজনের মনে ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়, শত্রুতার সূত্রপাত হয় এমন সকল কাজকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, যেমন বল,

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ

হে কিতাবীগণ, এসো সেই কথার দিকে যা তোমাদের মাঝে ও আমাদের মাঝে অভিন্ন (Al-Quran, ০৩:৬৪)।

তাছাড়াও ইসলামী জীবন ব্যবস্থার অন্যতম সৌন্দর্য হলো, পারস্পরিক আলোচনা পর্যালোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সম্পাদন করা। যে কোনো সমস্যা মোকাবেলায় পরামর্শ ভিত্তিক সমাধানের চেষ্টা করা। বর্তমান সময়ের বাস্তবতায় দেখা যায়, পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও সহিংসতা লেগেই আছে। এ সংঘাতকে সম্প্রীতিতে রূপান্তরের জন্য আন্তঃধর্মীয় সংলাপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার সংলাপ নবী মুহাম্মদ স. এর সময়ে অনেক জটিল পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছিল। যেমন নবী মুহাম্মদ স. যখন মদিনায় হিজরত করলেন তখন তিনি মদিনার সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সাথে সংলাপ করে একটি সন্ধিপত্রও রচনা করেন, যা ইতিহাসে মদিনা সনদ নামে পরিচিত। এটিই পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম লিখিত রাষ্ট পরিচালনার বিধান হিসাবে পরিচিত। তাছাড়াও নবী মুহাম্মদ স. হুদায়বিয়াতেও ভিন্ন সম্প্রদায়ের সাথে আলোচনা করে একটি যুদ্ধাবস্থাকে সম্প্রীতির পরিবেশে পরিণত করেছিলেন। এখানেও একটি সন্ধিপত্র রচনা করেছিলেন, যা ইতিহাসে হুদায়বিয়ার সন্ধি হিসাবে পরিচিত।

সংকীর্নতা পরিহার করে মুসলিমদের ইসলামের উদারতার ইতিহাস জানা প্রয়োজনঃ

ইসলামের উদারতার উদাহরণ একমাত্র মদিনা সনদই নয়। অন্য ধর্ম ও ধর্মাবলম্বীদের প্রতি ইসলামের উদারতার আরো অগণিত প্রমাণ পাওয়া যায় ইতিহাসের পাতায়। একবার নাজরানের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্বরূপ একদল খ্রিস্টান রাসুলুল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মদিনায় আসে। উভয় পক্ষের মধ্যে আলাপে আলাপে সন্ধ্যা হয়ে যায়। সন্ধ্যা মুসলিমদের মাগরিবের নামাজের সময়। খ্রিস্টানদেরও সান্ধ্য উপাসনার সময়। রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সান্ধ্য উপাসনার জন্য খ্রিস্টানদের মসজিদে নববীতেই স্থান দেন। একই মসজিদে খ্রিস্টানরা পূর্ব দিকে মুখ করে সান্ধ্য উপাসনা করেন। আর মুসলিমরা কাবামুখী হয়ে মাগরিবের নামাজ আদায় করেন। (বিশ্বনবী, পৃ. ৫০৮)

ধর্মীয় ব্যাপারে উদারতার এর চেয়ে বাস্তব উদাহরণ আর কী হতে পারে! সামাজিক শান্তির জন্য রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নানাভাবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করেছেন। কিন্তু তা কখনো ইসলামকে কাটছাঁট করে করেননি। মক্কার পৌত্তলিকরা একবার পৌত্তলিকতা ও ইসলামের মধ্যে কাটছাঁটের মাধ্যমে আপসের প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন রাসুলুল্লাহর কাছে। তাদের এ প্রস্তাবের জবাব আল্লাহই ওহির মাধ্যমে জানিয়ে দেন। আল্লাহ পাক বলেন, হে নবী আপনি বলে দিন-

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ

'তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম। আমার জন্য আমার ধর্ম'। (সুরা : কাফিরুন, আয়াত : ৬)

আর একবারের ঘটনা। মক্কার পৌত্তলিক কুরাইশ সর্দাররা একদিন রাসুলুল্লা সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর কাছে এসে বলল,

'হে মুহাম্মদ, তুমি যদি সুন্দরী নারী চাও, আমরা তোমাকে পরমা সুন্দরী নারী দেব। তুমি যদি সিংহাসন চাও, তা-ও আমরা তোমাকে দান করব। শুধু তুমি এ ধর্মটি প্রচার করা ছেড়ে দাও।'

উত্তরে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হে কুরাইশরা, তোমরা যদি আমার এক হাতে সূর্য আর অন্য হাতে চন্দ্র এনে দাও, তথাপি আমি যে সত্যের সন্ধান পেয়েছি, তা প্রচার থেকে বিরত হব না।' [মানুষের নবী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্দুল জব্বার সিদ্দিকী, পৃ. ৭০]

তাই বলে ইসলামে কাটছাঁটের প্রশ্নই ওঠে না। নিজের ধর্মে অটল থেকে শান্তির জন্য অন্য ধর্মাবলম্বীদের তাদের ধর্ম পালনে সমান অধিকার দেওয়াই রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আদর্শ। এটাই ইসলাম। এ জন্যই ইসলামের এক অর্থ আনুগত্য, অন্য অর্থ শান্তি। আনুগত্য মানে আল্লাহর আনুগত্য। আল্লাহর আনুগত্য মানে কোরআন-সুন্নাহর নির্দেশিত পথে অটল, অনড় ও অবিচল থাকা। আর শান্তি মানে মানুষে মানুষে সাম্য, জাতিতে জাতিতে মৈত্রী, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে সম্প্রীতি।

সত্যিকারের মুসলিম ব্যক্তি কখনো সাম্প্রদায়িক হতে পারেন নাঃ

যিনি সত্যিকারভাবে ইসলামকে বুঝতে পেরেছেন, তিনি কখনো অন্য ধর্মের প্রতি বিদ্বেষী হতে পারেন না। যিনি সত্যিকার মুসলিম, তিনি কখনো অন্য ধর্মাবলম্বীদের প্রতি শত্রুতামূলক আচরণ করতে পারেন না। যিনি সত্যিকার মুসলিম, তিনি কখনো দল-উপদলে বিভক্ত হতে পারেন না। কেননা হযরত আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরুকরে হযরত শিশ আলাইহিস সালাম, হযরত সুলাইমান আলাইহিস সালাম, হযরত দাউদ আলাইহিস সালাম, হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম, হযরত মুসা আলাইহিস সালাম, হযরত ঈসা আলাইহিস সালামসহ শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত আল্লাহ প্রেরিত প্রত্যেক নবী-রাসুলই ধারাবাহিকভাবে যে ধর্ম প্রচার করে গেছেন, তা-ই ইসলাম।

দুনিয়ার প্রথম মানুষ ও নবী হযরত আদম আলাইহিস সালাম যে ঐশী ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা শুরুকরেন, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর হাতে এসে সে ধর্মই পূর্ণতা লাভ করেছে। অন্যদিকে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর অনুসারীরা যেমন মুসলিম নামে খ্যাত, তেমনি মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর আগের নবীদের অনুসারী যাঁরা ছিলেন, ইসলামের পরিভাষায় তাঁরাও মুসলিম। পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবী পরবর্তী প্রত্যেক নবীর পূর্বসূরি ও পরবর্তী প্রত্যেক নবী পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবীর উত্তরসূরি বা পতাকাবাহী। তাই বিশ্বাসীদের কথা হলো,

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ

‘আমরা আল্লাহর রাসুলদের মধ্যে পার্থক্য করি না।’ (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৮৫)

সুতরাং বলা যায়, নিরপরাধ মানুষ হত্যা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা কিছুতেই ধর্মের শিক্ষা নয়। ইসলাম সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ধর্ম। কারো ওপর নিজের বিশ্বাস জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ইসলাম সমর্থন করে না। এসব কখনো ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শ হতে পারে না।

উপসংহার

জীবনধারণের জন্য মানুষের বহুমাত্রিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তার মধ্যে অতি মৌলিক হলো চারটি বিষয়। এগুলো হলো স্বাধীনতা, সত্য, সুবিচার ও সুখ। এদের মধ্যে সুখ হলো চূড়ান্ত লক্ষ্য। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সত্য ও সুবিচার প্রয়োজন। আবার এ তিনটির কোনোটিই অর্জন হবে না, যদি স্বাধীনতা না থাকে। তাই ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় সকল মানুষের জন্য এ চারটি বিষয়ের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে । মানুষের মাঝে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র, ভাষা কিংবা ভূখণ্ড আলাদা হওয়ার পরেও ইসলাম এমন বিধি নিষেধ আরোপ করেছে, যার ছায়াতলে সমস্ত মানুষ শান্তির অমীয় সুধা লাভ করতে পারে। মানবতার মাঝে সৃষ্ট মতানৈক্য, বিদ্বেষ, বৈরী মনোভাব, ও প্রতিহিংসার সংক্রামিত ব্যাধি নিরসনে ইসলামের সামগ্রিক ব্যবস্থা বিশ্ব মানবতাকে সাম্প্রদায়িক সংঘাতের বিষবাষ্প থেকে রেহাই দিতে পারে। বিশ্ব পরিবারকে একটি মানবীয় সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করে সকল সম্প্রদায়ের ন্যায্য অধিকার ও মর্যাদা সুরক্ষা করে মানব জীবনের পরম সুখ, শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়ন করার ইতিহাস তো একমাত্র ইসলামী শাসন ব্যবস্থায়ই রয়েছে।

Bibliography

Al-Quran

Abdul Latif, Mohammad. 2018. Islamer Shresthoetto O Anto Samprodayik Sampriti. Dhaka: Boi Polli.

Abu Daud, Sulaiman Ibn Ash‘as. 1420H. Al-Sunan (In 1 Vol.). Riyadh: Bait al-Afkar al-Dawliyya.

Ahmad, Imam Ahmad Ibn Hanbal. ND. Al-Musnad. Cairo: Muassasah Qurtubah.

Al-Badawi, Jamal. 2016. Onnanno Communitir Sathe Musalmander Somporko. Available on: https://cscsbd.com/1314

Al-Bukhari Abu ‘Abdullah Muhammad Ibn Isma‘il. 2002. Al Jami‘ Al-Sahih (In 1 Vol). Beirut: Dar Ibn Kathir.

Al-Tabarani, Sulaiman Ibn Ahmad. ND. Al-Mu‘jam al-Kabir. Cairo: Maktabah Ibn Taymiyyah.

Al-Tabari, Muhammad Ibn Jarir. 1387H. Tarikh al-Rusul Wa al Muluk. Beirut: Dar al-Turath.

Al-Tirmidi, Abu ‘Isa Muhammad Ibn ‘Isa. 1417H. Al-Sunan (In 1 Vol.). Riyadh: Maktabat al-Ma‘arif.

Anwari, Muhammad ‘Abdur Rahman. 2005. Islami Dawater Poddoti O Adhunik Prekkhapot. Dhaka: Bangladesh Institute of Islamic Thought.

Fadzil, Ammar. "Religious tolerance in Islam: theories, practices and Malaysia’s experiences as a Multi Racial Society." Journal of Islam in Asia (E-ISSN: 2289-8077) 8 (2011): 354-360.

Ibn Kathir, Abu al-Fida’ Isma‘il. 1988. Al-Bidayah Wa al-Nihayah. Beirut: Dar Yahya’ al-Turath al-‘Arabi.

Ibn Kathir, Abu al-Fida’ Isma‘il. 1999. Tafsir al-Quran al-‘Ajim. Madinah al-Munawwarah: Dar al-Tayyibah.

Muslim, Abu al-Ḥusain Muslim Ibn Ḥajjaj Al-Qushairi Al-Nishapuri. 2006. Al-Musnad al-Saḥiḥ (In 1 Vol). Riyadh: Dar Ṭayyiba. Nu‘mani, Allamah Shibli. 2012. Al-Faruq. Dhaka: Imdadia Pustakalaya Ltd.

Qutub, Sayyed. 1412H. Fi Jilal al-Quran. Beirut: Dar al-Shuruq. Umar, Badaruddin. 1995. Samprodayikata. Dhaka: Mawla Brothers.

ألا لا يجني جان إلا على نفسه ألا لا يجني جان على ولده مولود عن والده

ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا

فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرامة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا

أي: من احتاج منهم إلي مناظرة وجدال، فليكن باوجه الحسن برفق ولين و حسن خطاب.

يصدقةن بما جئت به من لله، وما جاء به من قبلك من المرسلين، لا يفرقون بينهم، ولا يجحدوم ما جاؤوهم به من ربهم.

قُلْ اٰمَنَّا بِاللهِ وَ مَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا وَ مَآ اُنْزِلَ عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْمٰعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ وَ يَعْقُوْبَ وَ الْاَسْبَاطِ وَ مَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰى وَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْ ۪ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۫ وَ نَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿۸۴﴾

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۭ بَيْنَنَا وَ بَيْنَك